

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Issue cover not available

Vol. 17 | No. 2 | 1974

 Check for updates

বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ

Volume	17
Issue	2
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	February 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v17i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i2.2
Pages	15-32
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ

আকরম হোসেন

আবেগ-অভ্যাস, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রবাহ, মতাদর্শ, ধর্মচিন্তা, তত্ত্বকথা ও দর্শন প্রভৃতির যোগফল সমাজ-চেতনা—যা বস্তুজগৎ বা সমগ্র সমাজজীবন ও প্রকৃতিলোকের নির্বিবাদী দর্পণ। সমাজ-সংগঠন যদি হয় শ্রেণী-বিভক্ত, জটিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ—চেতন্য-প্রবাহও হবে তার নিঃসন্দেহ অনঙ্গামী। সমাজ-চেতন্য এক সার্বিক প্রবাহ, যার অন্তর্গত রাষ্ট্রচিন্তা, নৈতিকতা, ধর্মচিন্তা, শিল্প-বিজ্ঞান পরস্পর বহমান, দর্শন প্রভৃতি গতিবান। প্রকাশ-মাধ্যম ও ব্যক্তির মানস-সংগঠনের বিভিন্নতায় একক চেতনাপ্রবাহ প্রজাতিতে বিভক্ত, তবে একে অপরে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অন্তর্গত সূত্রে পরস্পরসাপেক্ষ।

সমাজ-জীবনের অন্তর্গঠনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার বহির্গঠন অর্থাৎ চেতন্য-প্রবাহ। বস্তুত, সমাজ-জীবনের বিবর্তনশীলতা স্বায়ত্তশাসিত বা স্বয়ংক্রিয় নয় বরং তা নির্ভরশীল উৎপাদনযন্ত্র বা উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ওপর। সমান্তরাল সমাজের সবল ধ্যানধারণা নতুন—উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন-সম্পর্কবহ বর্জ্যে সমাজে কার্যতঃ অচল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যচিন্তা, সমাজদর্শন, রাধাকান্ত প্রমুখের সমাজতত্ত্ব, হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিতের কাছে হয়েছিল অগ্রাহ্য, পরিত্যাজ্য।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চেতন্যপ্রবাহও বহুভুজ হতে বাধ্য। কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষানুগ রাষ্ট্রীয়চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতিচেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যানধারণার যোগফলই হলো, সে একক চেতন্যপ্রবাহ। প্রতিটি শ্রেণী-উদ্ভূত চেতন্যপ্রবাহ স্বার্থানুগ এ কারণে যে, প্রতিটি শ্রেণীই তার সমাজ-দর্শনকে প্রতিযোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সচেতন, অর্ধচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করে।

শ্রেণীবিভক্ত-সমাজে মতাদর্শ যদি শ্রেণীচেতনার প্রতিভাস হয়, তবে সাহিত্য-শিল্প নিঃসন্দেহে সামগ্রিক জীবন-সত্য প্রকাশে অক্ষম। অথচ পরিপূর্ণকে আবিষ্কার, শাস্বত সত্যকে চিহ্নিত করাই হলো সাহিত্য-শিল্পের অম্বিষ্ট। সত্য নিরপেক্ষ নয়, বরং সাপেক্ষ।

সমাজ এবং চেতনার ক্রমবিকাশই শাস্বত। সমাজ-বিকাশের ধারায় যে শ্রেণী-উদ্ভূত জীবনদর্শন প্রগতিশীল, তাই তুলনামূলকভাবে সত্য এবং সুন্দর। যতক্ষণ বর্জোয়া-শ্রেণী, সামন্তশ্রেণীর সাথে সংঘর্ষরত, সে পর্যন্তই বর্জোয়া চেতনাপ্রবাহ সত্যসম্বন্ধ। যেমন রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শ ও ধর্মচিন্তা। কিন্তু যখন বর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ক্ষমতা অধিকারে সক্ষম হয়, তখন থেকেই সে হয় ক্রমবিকাশবিরোধী—অর্থাৎ সত্যবিরোধী।

এখানে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সমাজ সংগঠনের কঠোর শাসনে যদি চেতনা-প্রবাহ অক্ষম হইত মতো নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ব্যক্তিভাবনাও হবে শর্তবন্দীসাপেক্ষ ও শৃঙ্খলিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সত্যদর্শী নয়। কারণ সমাজ-গঠন যেমন ব্যক্তিদর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ‘ব্যক্তি-চেতনাও’ তেমনি সমাজগঠনকে প্রভাবিত করে। কোনো ব্যক্তি অধীতিবিদ্যা, ইতিহাসজ্ঞান ও সমাজবিকাশের মৌলসূত্র প্রভৃতিকে আত্মস্থ ক’রে ভবিষ্যৎ রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এবং দৃশ্যমান সত্যে পেঁচাতে ব্যক্তির সক্রিয় ভাবনা ও ভূমিকা বর্তমান সমাজগঠনকে প্রভাবিত করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ, ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া, প্রবহমানতা ও জটিলতা প্রভৃতি সম্পর্কে সমগ্রধারণাজাত-প্রতিভা, শর্তনিরপেক্ষ। এবং এটাই ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রাথমিক শর্ত। এই সূত্রেই Every novel is an extended metaphor of the author's view of life—on life itself.

সমাজ-শর্ত-নিরপেক্ষ প্রতিভাই কালোত্তীর্ণ, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের ধূলিঝড়ে কিংবা স্বার্থের অভিধাপে তারা নয় সত্যস্ব, কিংবা অকালত্যাগিত জন্মস্ব। শ্রেণীস্বার্থের চক্রপথে তারা মদ্রাদোষে নয় জ্ঞানপাপী।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভ কাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন কলেজ-স্কুল-উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিতের সমবায় ক্রমবিকাশিত ইচ্ছাচলিত ঢাকা শহর-কেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, যুরোপীয় বর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ মানবতাবাদকে অঙ্গীকার কল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন—‘মুসলিম সাহিত্যসমাজ’ এবং প্রকাশ করেন মাসপত্র ‘পিশখা’। এ সাহিত্যসমাজের আদর্শ ছিলো—‘চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয়সাধন ও সংযোগ সাধন।’ পত্রিকায় ছাপানো হতো, ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বর্দ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, বর্দ্ধি সেখানে অসম্ভব।’ এই বর্দ্ধির বর্দ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন—আবদুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল ফজল, কবি আবদুল কাদির, অধ্যাপক শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকী, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। “মুসলমানের ধর্ম নাই—তার জীবন নিত্যন্ত কুৎসিত”— মোখতার আহমদ সিদ্দিকীর উক্তি; অথবা “রাস্তায় চলতে মুসলমান বালক-বালিকার অস্বাভাবিক আলাপ ও গতিবিধি দেখলে আপনারা

রাগই করুন আর যাই বলুন মদসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করি” আনোয়ারুল কার্দের এই লেখায় ; কিংবা এ-সময়ের Swimming Club, Eating Club, Laughing Club, Anti-Pardah league এর প্রাণ-শক্তিতে ‘ইয়ং বেঙ্গলীয়’ উল্লাস, বেদনা, উদ্দামতার বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। বস্তুত এঁরাই ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-বঙ্গের ইয়ং বেঙ্গল। ঐতিহাসিক কারণেই ‘শিখা’ সম্প্রদায়ের মস্তবৃদ্ধিজাত চেতনা-প্রবাহ নিম্নবন্দ ছিলো না। রক্ষণশীল সামন্ত প্রতিনিধি ‘ঢাকার নবাব বাড়িতে’ লাঞ্চিত হয়েছিলেন আবদুল হোসেন। তৃতীয়বার থেকে মদসলিম হলে ‘মদসলিম সাহিত্য সমাজে’র ‘সাহিত্যসভা’ অন্তর্গত নিষিদ্ধ হয়। ‘মোহাম্মদী’ ও ‘সোলতান’—‘শিখা’ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ‘শিখা’ সম্প্রদায়ের ভাব-বিশ্ববের সংঘাত তরঙ্গে—পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের গণজাগরণের প্রবাহ গতিবান। এবং তা চার দশকের শেষ পর্যন্ত ছিলো পূর্ব-বঙ্গীয় (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) সাহিত্যিক বর্গের তথা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার উৎস-ভূমি, প্রাণক্ষেত্র। দশ দশকের শেষার্শ্বে বাঙলার মানসতটভূমে আছড়ে পড়েছিলো রূপ বলশেভিক বিপ্লবের তীব্র ভাবাবেগ। একালেই মজফ্ফর আহমদের প্রচেষ্টায় কলকাতায় জন্ম নিলো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। চার দশকে এঁরা হলেন সাবলম্ব, শক্তিবান ; প্রতিষ্ঠিত হলো জেলা-ভিত্তিক সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গান্ধীর ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের প্রতিকূলে তাঁদের মিত্রপক্ষ সমর্থন উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিলো না, ছিলো দূর-দর্শিতাবহ ; জার্মান কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলেই তা হয়েছিলো প্রমাণসিদ্ধ। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ফলাফলে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ সরকারী অবরোধ থেকে আপাত-মুক্ত হন। এ সময়ে কমিউনিস্ট সংগঠন ছিলো স্বচ্ছন্দ পদচারী, সদস্য-কর্মী হিসেবে আত্মপ্রচারে ও সক্রিয় অংশ পালনে, পূর্বাপেক্ষা বিপদাশঙ্কা ছিলো কম। এঁদের কর্ম-চাপ্টল্য, সেকালে নিরাপদ না হলেও, চরম নিরাপত্তাহীন ছিলো না।

ঢাকা শহরেও কমিউনিস্ট সংগঠন সক্রিয় ছিলো। মার্কসবাদী জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী বর্জোয়া মানবতাবাদী কিছুর ছাত্র ও বৃদ্ধিজীবী, বিভাগ পূর্বকালেই ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিভাগ পরবর্তীকালেও এর বৈঠক বসতো। যারা উপস্থিত থাকতেন তাদের মধ্যে কিরণশঙ্কর দাশগুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত (ক. দ. গ.), মদনমোহন বসাক, সরলানন্দ দাশগুপ্ত, কবীর চৌধুরী, শাহাদাৎ আলী, মদনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আবদুল্লা আলমদতি সরফদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

অসম সমাজ বিকাশের জন্য বিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকে চারের দশক পর্যন্ত—
পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনালোকে বর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিলো প্রগতিশীল

The Novel is the epic form of our modern bourgeois society... it did not exist, except in very rudimentary form, before that modern civilisation which began with the renaissance and like every new art form it has served its purpose extending and deepening human consciousness.

অথবা

While capitalism was basically foreign to the arts, it nevertheless favoured their growth and the production of an enormous range of many-sided, expressive and original works.

উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে ঔপন্যাসিক চেতনা-প্রবাহের ও জীবনদৃষ্টির দৃষ্টি স্রোত বহমান। একদিকে নজিবর রহমান, কোরবান আলী এবং শেখ ইদ্রিস প্রমুখ, অপর দিকে কাজী ইমদাদুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ূন কবির এবং আবদুল ফজল প্রমুখ।

নজিবর রহমান, কোরবান আলী, কিংবা শেখ ইদ্রিস—বর্জোয়া জীবন-বিজ্ঞাসা মধ্যী যতোটা নন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন সামন্তমূল্যমানে বিশ্বাসী। এই চেতনার পশ্চাতগামিতা তাঁদের সৃষ্টিকে দ্বিধাম্বিত করেছে। এ দিক দিয়ে নবজাগরণের সংস্কার-মুক্ত, মননশীল, যুক্তি-আশ্রয়ী জীবনবোধের অধিকারী ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক। সামন্তসমাজের অসঙ্গতিকে তিনি অঙ্কন করেছেন—আবদুল্লাহ্ উপন্যাসে। পূর্বা-বাঙলার সামন্তজীবনের তথা মুসলিম সমাজের ধর্মসংস্কার, পীরভক্তি, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বর্জোয়া ভাববাদী প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো আবদুল্লাহ্ উপন্যাসে। এই চেতনা-প্রবাহকে প্রসারিত করেন কাজী আবদুল ওদুদ এবং হুমায়ূন কবির। এই পর্বের ঔপন্যাসিকদের জীবন-দৃষ্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো : [এক] জীবনের totality বা সমগ্রতায় বিশ্বাস ; [দুই] বর্জোয়া জীবন চিন্তা liberty, equality and fraternity তে আস্থা ; [তিন] ঔপন্যাসিকদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ; [চার] শিল্প-জিজ্ঞাসায় তাঁরা ছিলেন formal realist. জীবনের যথাযথ রেখা, প্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে তাঁরা জীবনকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। এঁদের সামগ্রিক জ্ঞান-অনুভূতি, বোধ ও অভিজ্ঞানকে চৈতন্যের অন্তর্গত সংস্পর্শে করতে পারেননি চিত্রকল্পরূপে উদ্ভাসিত, পশ্চিমীন্দ্রের কাছে অর্থহীন,

আবেগবাদী ও ব্যঙ্গনায় গৌরবান্বিত। কারণ শ্রেণী হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিলো অপদ্রষ্ট, অশক্ত।

এ পর্বের আবদুল ফজল এক স্বতন্ত্র নাম। পদনর্জাগরণের সমাজ-চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টিকে একত্রিত করার প্রবণতা, সংস্কার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও “সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ” আবদুল ফজলকে চেতনা-প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর করেছে। এই সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে প্রাণিত করেছিলো—কল্লোলের অনঙ্গসরণে হাতে লেখা পত্রিকা ‘প্রগতি’ প্রকাশে। ১৯২৭-এর ‘চৌচির’ উপন্যাসে—মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন-চেতনা শিল্পিত হয়েছে। তিরিশোত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যারীতিকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন আবদুল ফজল। ‘জীবনপথের যাত্রী’ উপন্যাসে ক্রয়েডীয় মনো-বিজ্ঞানের পদধ্বনি শোনা যায়; বুদ্ধি-নির্ভর সমাজতান্ত্রিক চেতনা রূপায়িত হয় ‘রাঙা প্রভাত’ উপন্যাসে। ঘটনাবিমুখ অন্তর্চেতনা-প্রবাহের শব্দরূপ ‘প্রদীপ ও পতঙ্গ’। ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর শিল্প-সাধকতা আবদুল ফজলের কাছে প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। কারণ ‘পশ্চিম-বঙ্গীয়’ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত শত বছরের বর্জ্যোয়া অর্থনৈতিক অবস্থার অন্ত-অসঙ্গতি, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা, বর্জ্যোয়া মানবতাবাদের প্রতারণার অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিস্কত মূল্যবোধের উত্তরাধিকার নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন আবদুল ফজল। পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতিহাসের ‘কালো সিঁড়ি’ তখনো অতিক্রম করেনি। কাজেই কল্লোলের চেতনা আবদুল ফজল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন—জীবনের সামগ্রিকতা দিয়ে আত্মস্থ করতে পারেননি। এ কারণে আবদুল ফজলে চেতনার শব্দ জ্যামিতিক প্রমাণ আছে—মন ও মননের, ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার, চরিত্র এবং ব্যাখ্যার—নতুন শব্দ, বাক্য, দৃষ্টিভঙ্গিজাত চিত্র-কল্প নেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে আবদুল ফজল প্রমুখের প্রাগ্রসর চেতনা-প্রবাহ ও প্রাকরণিক স্রোত—গিরিকন্দর অতিক্রম করে সমতল পেয়েছে পাক-আমলের সমাজ-গঠনে, প্রতিভার মনোভূমে।

মধ্যবিত্তের সংকট ও পাক আমলের বাংলাদেশ : প্রথম পর্ব

১৯৪৮ সালের মধ্যেই পূর্ব বাংলার উঠতি বেনিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং তার পক্ষপটে লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুভব করলো তাদের সংকট। পাকিস্তানী বহু বেনিয়া-পুঁজি অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করলো পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং উৎপাদনযন্ত্র। এবং এ কার্যে ‘ধর্ম-ঐক্যের’ নামে, ‘শ্রমস্বার্থের’ প্রয়োজনে, তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করলো—এদেশীয় সামন্তশ্রেণী ও সামন্ত-মূল্যবোধ-লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। দেশীয় সামন্তশোষণ ও পাকিস্তানী বড় বণিক বেনিয়াদের শোষণে, শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে এবং ইতোমধ্যে কাঁচামাল ও বাজারের লোভে পূর্ব বাংলা গড়ে উঠলো আধা ঔপনিবেশিক

নাট্যিক রীতি ব্যবহার করেছেন, কখনো চিত্ররীতি প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসটিতে বিস্তৃত ক্যানভাস ব্যবহৃত হলেও, অধিকাংশ রঙের ব্যবহার হয়েছে দরিয়া চরিত্র অঙ্কনে। এই শিল্পসৃষ্টির স্বন্দর-বহুর জীবনের অর্থৎ সামন্ত-সমাজের অন্ত-অসঙ্গতিজাত স্বাঙ্গিক অগ্রগামী চিত্ররূপ হতে গিয়েও ‘জননী’র দরিয়া বিবি ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। মাতৃত্বের গৌরবই হয়েছে সারকথা। দরিয়া বিবির চেতনায় জীবন-সংগ্রাম মাতৃত্ব উৎসজাত। শওকত ওসমানের Pictorial treatment এবং Dramatic treatment -এর জন্ম তার যথাস্থিতবাদী নিরাসক্তি। ‘জননী’ শওকত ওসমানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রাক-৪৭ আমলে রচিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালদ’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এ। ভন্ড ও ধূত মজিদ চরিত্র অঙ্কনের জন্য, কিংবা সামন্ত সমাজজীবনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের চরিত্র চিত্রনের জন্য ‘লালসালদ’ গৌরবান্বিত নয়। মজিদ টাইপ চরিত্র হয়নি—তার পরাজয়ে পাঠকমনে করুণা সঞ্চারিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনের উপরিতলের চিত্র অঙ্কন না করে, সমাজ-মূলের অসঙ্গিতকে উন্মোচন করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কৃতিত্ব, অভিজ্ঞানকে তিনি নিরাসক্তিতে পরিণত করেছেন ; ঘটনাকে প্রতিক্রিয়ায় রূপ দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়ার আবেগকে চিত্রে অঙ্কন করেছেন, impressionist শিল্পীদের মতো :

খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা।
ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সেই আকাশ ছোঁয়া।
ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয়, ভাঁপের ; যেন শত সহস্র সাপ শিষ দেয়। উজ্জ্বল
আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে বাকবাক
করে। সেই ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসানীর মাকে, তার পরণে
বেগুনী শাড়িটা। যে আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শব্দতায় উজ্জ্বল করে
তুলছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মত্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহুটা
উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

আত্মস্থ রচনামূলক ‘লালসালদ’কে কাব্যিক পরিমন্ডলে উত্তীর্ণ করেছে, যেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি একাত্ম। তার সাংগীতিক রীতি, মন এবং মননকে, মানুষ এবং প্রকৃতিকে জৈবিক ঐক্যদান করেছে। চরিত্র কিংবা ঘটনা-বিন্যাসে কোথাও চড়া রঙ ব্যবহৃত হয়নি। সমাজ-সম্পৃক্ত কর্মদায়িত্বচ্যুত, সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক ‘আমি’ বোধ থেকেই এই নিরাসক্তি, গীতিময়তা ও আত্মগত চেতনার জন্ম। বর্জ্যোয়া সমাজ-বিন্যাসের আন্ত-জাতিক অসঙ্গতি, স্বকাল সংকটের প্রতিক্রিয়ার পলায়নবাদী চেতনাসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শিল্প অভিজ্ঞানের জন্ম। এই অর্থে তিনি ‘কল্লোল’ চেতনার যথার্থ কাছাকাছি।

পুঁজিবাদী সমাজে অন্তঃসঙ্গিতর প্রতিবাদী চেতনা হিসেবেই রোমান্টিকতার জন্ম। রোমান্টিকতা পেটি বর্জ্যেয়া চেতনাপ্রবাহ। রুশোর Discourses থেকে Communist-manifesto -র প্রকাশ অন্তর্বর্তীকাল পর্যন্ত যুরোপের নিয়ন্ত্রক চেতনা ছিলো রোমান্টিকতা। পূর্ব বাঙলার অবিকশিত-পুঁজিবাদী-আশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চরিত্রে রোমান্টিকতার 'হ্যাঁ অর্থ' দিক অপেক্ষা 'না অর্থ' দিকটিই ছিলো অধিকতর সক্রিয়। শামসুদ্দিন আবদুল কালাম ছিলেন মূলতই রোমান্টিক। তাঁর 'কাশবনের কন্যা'র রচনাকাল ১৯৪৭/প্রকাশ কাল ১৯৫৪। ভাবাবেগ, অকৃত্রিমতা, উচ্ছ্বাস এবং গীতিময়তা আবদুল কালামের জীবনবোধের অন্তলক্ষণ। 'কাশবনের কন্যা' চরিত্রগদ্যে সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অতিরোমান্টিকতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সদৃঢ় হতে পারেনি। রোমান্টিকতার অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসটিকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও গ্রাম বাঙলার মাটির ঘ্যাণ, আবেগীচিত্র ভেসে আসে উপন্যাসের শব্দস্রোতে। শামসুদ্দিন আবদুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' অনভূতির সত্যায় প্রথম পর্বের একটি বিশিষ্ট রচনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গদ্য গীতল, কিন্তু বদ্বিধাশ্রুত, শামসুদ্দিন আবদুল কালামের গদ্য গীতিময়, কিন্তু আবেগী এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

আবদ ইসহাকের 'সূর্যদীঘলবাড়ি' বহু-বিতর্কিত উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৫৫। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব বাঙলার সমালোচকগণ একে 'বিস্ময়কর', 'শিল্পকুশল', 'সার্থক সাহিত্য', 'স্মরণীয় সাহিত্য' বলে প্রশংসা করেছেন এবং অপরপক্ষে কেউ কেউ 'সূর্যদীঘলবাড়ি'কে 'সার্থক উপন্যাসই নয়,' 'স্কেচধর্মী রচনা' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এবং এর সমর্থনে সাংগঠনিক ত্রুটি ও চরিত্র চিত্রনের অপরিমিততার উদাহরণও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। সব সমালোচকের উক্তিগদ্যে পরীক্ষা করলে সত্য পাওয়া যায়, কিন্তু কারণ পাওয়া যায় না। আবদ ইসহাকের 'সূর্যদীঘলবাড়ি' ভূতুড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো গৃহকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, উন্মূলিত জয়গদন পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী। হাসদর শহরের জীবনসংগ্রাম—গ্রাম বাঙলার অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সংকেতবহ। নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি দিয়ে আবদ ইসহাক ঢাকা শহরের সন্নিকটস্থ—স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উপলক্ষে উৎসব এবং ঈদ ইত্যাদির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা গতিবান। জয়গদনের জীবনের সংগ্রাম ও অবশেষে ছিন্নমূল হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মাঝেও যে 'সূর্যদীঘল বাড়ি'র ট্রাজিক পরিণাম দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তার কারণ আবদ ইসহাকের শিল্পদৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। আবদ ইসহাকের চোখের এবং মনের দেখা জীবন ও জীবন-চিত্র—মননে পরিশীলিত হয়ে প্রাগ্রসর চেতনাপ্রবাহের শব্দরূপ পায়নি। আবদ ইসহাক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন—যে গ্রামীণ পরিবার উন্মূলিত হচ্ছে নতুন সমাজব্যবস্থার কৃত্রিম বিন্যাসে। 'করিম বক্তের মৃত্যু উপন্যাসিক পরিণামের কারণ হিসেবে দরবল' এই জন্যেই।

আবদ ইসহাক গ্রাম জীবনের স্হবিরতার চিত্রে অধিক আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আপাততঃ স্হবিরতার মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব-সংকুল গতি বহমান তা তিনি ধরতে পারেননি। এ কারণে তাঁর বান্ধব-আবেগীচিত্রগুলিতে বেগ সঞ্চার হয়নি।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘চন্দ্রাবীপের উপাখ্যান’ (১৯৫২ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্বলিত শ্রেণী-চেতনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু গাফফার চৌধুরী মনে বর্জোয়া রোমান্টিক এবং মানবতাবাদী, মননে শ্রেণীসচেতন। চন্দ্রাবীপের উপাখ্যানে—যে দ্বান্দ্বিক জীবনাগ্রহের সামগ্রিক রূপ উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো—তা বিক্ষত হয়েছে—ঔপন্যাসিক চেতনালোকের অর্থাৎ মন-মননের দ্বন্দ্ব। উপন্যাসের প্রতিজ্ঞা এবং প্রমাণের মধ্যে মেরুদূর সম্পর্ক। আবদুল গাফফার চৌধুরীর ভাষারীতি স্বায়ত্বশাসিত ও জীবনের বহুভুজ বোধের ভাব বহনে সক্ষম। ‘সামনে নতুন দিন’ (১৯৫৬) রচয়িতা আবদ রশাদ মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণাকে এড়িয়ে নগর জীবনের বাহ্যিক অবয়বকে অংকন করেছেন। এ কারণে ফর্মের কোনো আবিষ্কারেও নিরুৎসাহ। সবল বক্তব্য সত্ত্বেও সরদার জয়েন্দাঙ্গিনের ‘আদিগন্ত’ সংগঠনের, শব্দ-নির্মিতিতে এবং মননশীলতার অভাবে দর্বল রচনা। আকবর হোসেন, নাজির রহমান, শেখ ইদ্রিস ফর্ম-অনুসারী আখ্যায়িকা রচয়িতা মাত্র। দৌলতুন্নেসা, ইসহাক চাখারী, কাজী আফসারউদ্দিন প্রমুখ ঔপন্যাসিক মূলতঃ প্রাক-৪৭ ধারারই পদাঙ্ক-চারী। দৌলতুন্নেসা তাঁর সদ্বহং ‘পথের পরশ’ উপন্যাসে স্হবির, অচল, গ্রাম জীবনকেই অংকন করেছেন। জীবনের তথা সমাজের দ্বন্দ্ববাদী ক্রমবিকাশে তিনি বিশ্বাসী নন, বরং তিনি সমাজ সমন্বয়বাদী। ঔপন্যাসিক গঠনে ও চরিত্র-চিত্রনে দৌলতুন্নেসা অকৃত্রিম এবং আন্তরিক। প্রকৃতিকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণের আত্যন্তিক চেতনায় কাজী আফসারউদ্দিন বিশিষ্ট।

প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই ঘটনাংশ নির্বাচনে গ্রামমুখীন, জীবন-দৃষ্টিতে বর্জোয়া মানবতাবাদী। জীবনের দ্বান্দ্বিক-বিকাশ-ধারা, গ্রাম-জীবনের তথা সমাজের অন্ত-অসঙ্গতিজাত প্রবাহমানতা নিরীক্ষণে অধিকাংশই অসমর্থ। সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ, আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং শামসুদ্দিন আবদুল কালাম ব্যতীত কমবেশী সকলই—প্রাক-৪৭ পর্বের মূল্যবোধের পদাঙ্কচারী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা, আত্মমুখিতা ; আবদুল গাফফার চৌধুরীর মার্কসীয় চেতনার প্রতিশ্রুতি এবং শামসুদ্দিন আবদুল কালামের পেটি বর্জোয়াসুলভ ‘না অর্থক’ রোমান্টিকতা প্রসূত ত্রয়ী চেতনাবোধ ১৯৪৭-৫৭ কাল পরিসরের সমাজচেতনা প্রবাহে নতুন সংযোজন।

কালো দ্বৈত ও বাংলাদেশ : দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫৮-১৯৭০

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭—কাল পরিসরে পাকিস্তানী বেণিয়া পুঁজি 'শিল্পপুঁজি' হিসেবে বিকশিত। কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য—প্রতিযোগিতাহীন এলাকা প্রয়োজন। পূর্ববাংলার উপর প্রতিষ্ঠিত হলো সামরিক শাসন। গত দশ বছরের নড়বড়ে বাংলার সামন্ত-সমাজকে পুনর্বিবিন্যস্ত করা হলো 'Basic Democracy'-র শৃংখলে। অখণ্ড পাকিস্তানের স্লেগান, পরাজিত প্রায় সামন্ত-ধ্যানধারণা, ধর্মমোহ, সাম্প্রদায়িকতা হলো পুনরুজ্জীবিত।

পক্ষান্তরে ৪৭-এর বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ সময় ক্ষীণতকায়। ১৯৬০-৬১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৬৬৭ জন। ১৯৭১ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার লক্ষ। অথচ সম্মুখে রয়েছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্বের সংকট, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। বেতার যদি জীবনগ্রহের স্বাক্ষর হয়, তবে তার লাইসেন্স ১৯৪৭-৪৮ সালের ৫,৩৭৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭-তে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৫৩। অথচ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধীন চিন্তাশ্রমতা হয়েছে লুপ্ত। তাদের জীবন হল বন্দী প্রহরের যোগফল।

এ পর্বে যে সব সাহিত্যিক আবির্ভূত হলেন, বস্তুতই, তাঁদের সম্মুখে ছিল বন্দীমহত, অলঙ্ঘ্য দেয়াল, অবরুদ্ধ সমাজ-চেতনা ও জটিলতম সমাজগঠন। চলার পথে অগ্রজের সংঘর্ষ-উপদ্রুত পদক্ষেপের চিহ্ন নেই; তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, নিরাপদ আশ্রয়ে আসীন। এ কালের সাহিত্যিকদের মানসচক্রের হেডলাইটে উদ্ভাসিত হয়েছে—সুউচ্চ প্রাচীর, অকাল এবং সর্বাধাভোগীর পরিতৃপ্ত মদ্যচ্ছবি।

প্রাক-৪৭ পর্বের এবং ১৯৪৭-৫৭ পর্বের অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী পূর্ব-প্রতিশ্রুতিদ্রষ্ট। পাক-শাসকগোষ্ঠী সচেতন-বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকদেরকে রেডিও, টেলিভিশন, প্রেস ট্রাস্ট, বি.এন.আর এবং লেখক সংঘের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত ও বেতন-দাসে পরিণত করতে সচেষ্ট হল। কারণ All mass media Press Cinema, Radio, Tv. etc. are utilised, for example, by imperialist bourgeoisie to poison the minds of the working people and disarm them ideologically.

পরিবর্তন ঘটল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের। তাঁরা জীবিকার উন্নতির ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাহিত্যভাবনা এবং শিল্প-শরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ ফ্রেগেডে আশ্রয়ী, কেউ স্বল্পভাষী; কেউ বা আত্মগোপন করলেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। মানবতাবাদী শ্রেণী অংশত আক্রান্ত হলেন, কারণ অশক্ত বর্জ্যোন্মা

মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা ততোধিক নিরাপদ। এদের অধিকাংশই হলেন আত্ম-রোমন্থনে তুণ্ট, কল্পলোকের জ্বলন্ত জড়গৃহে যন্ত্রণাবিন্দ, ক্রমবিকাশে শঙ্কাগ্রস্ত, দেহবাদী পক্ষে আকণ্ঠ নির্মাজ্জিত।

১৯৫৮-৭০ পর্বের সাহিত্যিকদের স্ব-কালকে আত্মস্থ ও বিচার করার উৎসাহ ছিল না যেন। এদেশে বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস নেই ; ধর্ম আছে, তা বহু ব্যবহৃত ; রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রনীতি নেই ; বামপন্থী আন্দোলন বহুধা খণ্ডিত ; সিদ্ধান্ত আর তত্ত্ব-গবেষণায় নেতৃবর্গ তখন ব্যস্ত। তাঁদের কাছে, অন্তরঙ্গ চেতনা-স্রোতে, পাকিস্তান 'লব্ধ স্বপ্ন' ; বর্জোয়া সমাজমূল্য, যা ইতোমধ্যে ইউরোপে ক্ষয়িষ্ণু, ব্যর্থতায় বিচূর্ণিত।

ইতিহাসের গতিতে নয়, তাঁদের দৃষ্টি, মন ও মনন—সংযুক্ত হল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর অবক্ষিত ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত ও পেটি বর্জোয়া বর্দ্ধিজীবীদের ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াজাত সাহিত্যভাবনা ও শিল্পরীতিতে। তাঁদের কাছে সখদ এবং আত্মীয় মনে হলো ভার্জিনিয়া উলফ্-এর কণ্ঠস্বর—on or about December 1910, human character changed, এ-সময় ১৯১০-এ লন্ডন গ্রাফটন গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছিলো ভ্যানগগ, মারিস, সেজান ও পিকাসো প্রমুখের ছবি।

স্মরণ রাখা দরকার, ইউরোপীয় পেটি বর্জোয়া শ্রেণীর তৎকালীন সাহিত্যদর্শ হলো ধ্বংস-উন্মুখ পূর্জিবাদী সমাজের প্রতিক্রিয়া-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী জীবন-দর্শন। পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার সমাজ-গঠন অর্ধ সামন্ত, অর্ধ ঔপনিবেশিক। সত্তরাং অসম সমাজের দুই আদর্শ-প্রান্তে জীবনের, তথা শিল্পের, জ্যা পরাতে অগ্রসর হলেন এ পর্বের ঔপন্যাসিকগণ।

এ পর্বের ঔপন্যাসিকদের কাছে, ব্যক্তিচেতনাপ্রবাহ অধিকতর শ্রদ্ধাবহ, সমাজ শত্রু, প্রতিপক্ষ। রাজনীতি, কল্যাণ পরিত্যাজ্য ; প্রেম, প্রহসন আর রিরংসার যোগফল। একালের ঔপন্যাসিকদের প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখিতা এবং আত্মসর্বস্বতা ; জীবন নামক শত্রুকে নির্বাসিত করার অক্লান্ত প্রয়াস। রূপবন্ধে—মণিচিত্রকল্প, বিচূর্ণিত উপমা-রূপক-প্রতীক প্রয়োগ তাঁদের অন্বিষ্ট। গত দশ পর্বের সমাজ-সম্পৃক্ত কর্মচেতনাকে এঁরা আত্ম-মগ্ন-চৈতন্য-অশ্বকারে করলেন উপহাস। এঁরা আত্মভুক চেতনাশ্রয়ী ; বিকৃত সমাজ-গঠনের চারদেয়ালে শৃংখলিত, সমাজ-শত্রুসাপেক্ষ, ব্যক্তিপ্রতিক্রিয়াবাদী। এই চৈতন্য-সামগ্রীই এ পর্বের ঔপন্যাসিকদের গৌরব এবং দর্বলতা। জলন্তভেদ মত উদ্বর্গামী কোন প্রতিভা শতমুদ্র সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে অবরুদ্ধ অবক্ষয়, অচলতাকে চাবুকঘাত করে সচল করেনি। এমনকি ইতিহাসের অলোকদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমাজ-অন্তর্গত ক্রমবিকাশের কণ্ঠ-শক্তি-স্রোত সম্মুখে তাঁদের ছিল অনীহা।

১৯৪৭-৫৭ পর্বের ঔপন্যাসিকগণ একালে ছিলেন সত্যান্বিত ; আর এ পর্বের ঔপন্যাসিকগণ হলেন জন্মান্বিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ঔপন্যাসিকদের যৌথ চেতনা-প্রবাহ, জীবনদর্শন এবং তাঁদের রূপবন্ধ, চরিত্রনির্মাণ, চিত্রকল্প-উপমা-রূপক প্রতীক নির্মাণের অস্বিন্নতায়, অবজ্ঞায়, আশ্বাসে, অভিনবত্বে আমাদের বন্দীচেতনা দ্রোত বিধৃত ; ওঁদের বোধ-বোধি-চেতনালোক আমাদের উৎপীড়িত বিবেক, অক্ষমতার আত্ম-নাদ, সত্যস্বের বিবেকী ধিক্কার ; জন্মান্বের আত্মমর্য্যক্তির ক্রমিক পরিণাম।

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস ১৯৫৮-১৯৭০

দ্বিতীয় পর্বের ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, ১৯৪৭-৫৭ পর্বের ঔপন্যাসিকদের চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ; দ্বিতীয়ত, এ পর্বের নতুন ঔপন্যাসিকদের রেখাচিত্র অঙ্কন।

শওকত ওসমানের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—একালে। ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৩) ; সমাগম (১৯৬৮) এবং রাজাউপাখ্যান (১৯৭০)।

শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’ প্রতীকশ্রয়ী উপন্যাস। ‘দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব—ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না’—নায়কের উক্তি এ উপন্যাসের সারকথা। এবং এ জীবনদর্শন সর্বকালেরও বটে। রূপবন্ধ নির্মাণে হারদগর রশ্মিদের বাগদাদের কাহিনীকে নাট্যরঙ্গীততে পরিচর্যা করেছেন। চরিত্রগর্ভালি—এক একটি চেতনার প্রতীক। খলীফা ও মশরুর, তাতারী এবং কবি নওয়াস—যথাক্রমে ক্ষমতাঅন্ধ অত্যাচারী, অত্যাচারিত মানবতার এবং শাস্বত সৌন্দর্য ধারণার সংকেতবহ। ভাষারঙ্গীতি বিষয় প্রকাশে যথাযথ। ‘সমাগমে’ শওকত ওসমান ফ্যান্টাসীর জগতে পদচারী। ‘রাজাউপাখ্যান’ প্রতীকশ্রয়ী হলেও, গল্পরস প্রধান। Treatment-এ বিবরণধর্মী এবং নাট্যিক।

প্রশ্ন উঠবে, ‘জননী’র বৃহৎ ক্যানভাস বাদ দিয়ে এ পর্বে শওকত ওসমান কেন ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় থেকে ঘটনাংশ নির্বাচন করলেন ? কেনই বা তিনি পরিত্যক্ত হলেন ‘ফ্যান্টাসীর’ উদ্ভট জগতে ! এ পর্বে শওকত ওসমানের কীর্তিত্ব—তিনি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার সঙ্গে শিল্পভাবনাকে প্রগতিশীল ও সৃষ্টিমুখী রাখার জগত আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে স্মরণযোগ্য, জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন ‘There comes a moment of decision’ এবং শিল্পীমানস

either break through to socialism or founder in fatalism, symbolism, mysticism and reaction. শওকত ওসমানের প্রতীকশ্রয়ী মানস-চেতনার জন্ম-স্বকাল-সংকট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই। শওকত ওসমানের কৃতিত্ব তিনি তাঁর পলাতক চেতনাকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দশটি উপন্যাস—‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৮) এবং ‘কাঁদো নদী কাঁদো।’ (১৯৬৮)। ‘লালসালতে’ প্রবাহিত ওয়ালীউল্লাহর সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চেতনাপ্রবাহ এ পর্বে আত্মনিমগ্ন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্থিতধী। “কোন সংকটকালে পরিবেশকে উপেক্ষা কিংবা অতিক্রম করে ব্যক্তির যে অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তির সেই অস্তিত্বই সার বা মূল অস্তিত্ব। ব্যক্তির এ অস্তিত্ব বর্দ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কোন সংকট মহাতে মানদ্য, এর আলোতে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।” স্কুল শিক্ষক আরেফ আলীর আত্মগত দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে, কাদের যে যথার্থ হত্যাকারী, এই সত্য প্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন শিল্পায়িত হয়েছে। আরেফ আলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংকটাক্রান্ত ভয়, আবেগ, রক্তাক্ত অনর্ভূতির রূপবন্ধ ও চিত্রকল্প সৃষ্টির সার্থকতা এ উপন্যাসের গৌরব। ধ্রুপদী ভঙ্গীর ভাষারীতির মধ্যে আবেগের বেগ সঞ্চারিত হওয়ায় এ উপন্যাসের ভাষা চেতনার চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সার্থক।

ফর্ম নিরীক্ষায় এবং উপস্থাপনের রীতিতে ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ অভিনব। তবারক ভুইঞার গল্পসহলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কুমারডাংগা মফস্বল শহরের জন-জীবনের আতঙ্ক, ভয়, ভীতি, আশঙ্কা এবং অভিব্যক্তি যেমন বিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি ‘এক শ্রোতার’ আত্মমগ্ন চেতনা-স্রোতের শব্দরূপে মদহুম্মদ মদস্তফার জীবনদ্বন্দ্ব, ভয় এবং পরিণাম অঙ্কিত হয়েছে। কুমারডাংগার উকিল কফিল-উদ্দীন, বোরহানউদ্দীন ডাক্তার, মোহন চাঁদ, কালদ মিঞা, ছলিম মিঞা, মিহির মন্ডল, হবদ গিয়া, সাকিনা খাতুন প্রভৃতি চরিত্র স্বল্প রেখায় স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল। ঘটনা বিন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বহুক্ষেত্রে ড্রামাটিক ট্রিটমেন্ট করেছেন। কিন্তু মদহুম্মদ মদস্তফা চরিত্রের ভয়, ভীতি, দ্বন্দ্ব-আশঙ্কা, আত্মনিমগ্ন রক্তাক্ত চেতনা-পদঞ্জের চিত্রাঙ্কনে অভিব্যক্তিবাদী, কোন কোন ক্ষেত্রে পরাস্তববাদীও বটে। যেমন : মদস্তফার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালীন অনর্ভূতি :

সড়কেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরুর করে : সড়কেসটি যেন একটি শব্দক রক্ত গাঢ় কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের

দিকে ডাকায়। ... এবং কলিজাটি আকারে সহসা ছোট হয়ে ল'ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা বাপটাতে শব্দ করে। ইত্যাদি।

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য, অস্তিত্ববাদ ইউরোপীয় পচনশীল বর্জ্যেয়া সমাজ-অন্তর্গত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত মনের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চরম আত্মরতি-মূলক প্রতিক্রিয়া।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬২), 'নাম না জানা ভোর' উপন্যাস দুটিতে নগর জীবনায়তন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর রোমান্টিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্বের মার্কসবাদী চেতনা লব্ধ প্রায় ; বরং রোমান্টিক দৃষ্টি স্বেচ্ছা উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছে।

রোমান্টিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ পর্বে জীবন-পলয়ানবাদী। 'কাঞ্চন-মালা'র রোমান্সধর্মিতা প্রায় উপাখ্যানে আত্মতৃপ্ত। 'কাশবনের কন্যা'র অন্তরঙ্গ গীতল জীবনজিজ্ঞাসার স্বাক্ষর এ উপন্যাসে অন্তর্দৃষ্টিত।

'পান্নামোতি' (১৯৫৬) এবং 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৫৫) উপন্যাস দুটির প্রকরণগত সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে 'অনেক সূর্যের আশা' এ পর্বের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাসটি উত্তমপদরূপে লেখা। বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, দরিদ্রতা, দাঙ্গা, মানুষ্যের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষ্যের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোন কোন চিত্রে এবং আখ্যানে রোমান্টিক কল্পনা-আতিশয্য-অন্তরঙ্গ বস্তু-নিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চরিত্রগুলি চলমান ; ভাষারীতি উপযুক্ত। 'অনেক সূর্যের আশা' সরদার জয়েনউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

প্রথম পর্বের দৌলতুন্নেসার 'বধূর লাগিয়া' (১৯৬২) একালের অন্তর্গত।

১৯৫৮-১৯৭০ পর্ব : নতুন উপন্যাসিকদের রেখাচিত্র

এ কালের নব্য উপন্যাসিকদের প্রধান লক্ষণ-অন্তর্মুখিতা। আত্মমগ্ন চেতনা-প্রবাহ এবং মনোবিকলন রীতিতে এরা অধিক আগ্রহী। রাজিয়া খান, সৈয়দ শামসুল হক এবং আলাউদ্দিন আল-আজাদ-এঁদের মধ্যে অন্যতম।

রাজিয়া খানের দুটি উপন্যাস : 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯) এবং 'অনন্দকল্প'। (১৯৫৯) বটতলার উপন্যাসের মঈন, সন্নিহিত, হেটি, শামসা, তরু, মিষ্ট-সবাই যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপ। সবাই জীবনের সজ্জিত সন্ধানী, শান্তির প্রত্যাশী

—অথচ শূন্যতাবোধ তাদেরকে নিঃশেষিত করল। বিশ্লেষণী টাচ জেদে যত আত্মসমীক্ষা করছে, ততই অশ্বকার যেন গাঢ় হচ্ছে। আধুনিক নিঃসঙ্গ মানবের রক্তক্ষরণের শব্দরূপ উপন্যাস দুটি। আত্মিক প্রকরণে—বটতলার উপন্যাস—সদৃশগঠিত হয়েও দরবলতার চিহ্নবহ। আতিশয্যহেতু ঘটনা এবং কাহিনী ভারসাম্যহীন পল্লবিত। ‘অনুদূপ’ ফর্মের দিক দিয়ে অনেক বেশী সদৃশগঠিত। রাজিয়া খান—জীবনের চেতনা-প্রতীতির সঙ্গে বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন treatment-এর প্রশ্নে। ঘটন এবং প্রতিক্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠা কল্পে জীবনের বাস্তব প্রচ্ছদকে স্বীকার করেছেন। রাজিয়া খান বিশ্লেষণ-ধর্মী। বিমূর্ত চেতনাপদ্যকে বিমূর্ত অবয়বে প্রকাশ করতে তাঁর আগ্রহ নেই।

সৈয়দ শামসুল হক-এর উপন্যাস ‘এক মহিলার ছবি’ (১৯৫৯), ‘দেয়ালের দেশ’ (১৯৫৯), ‘অনুদূপ দিন’ (১৯৬২), ‘সীমানা ছাড়িয়ে’ (১৯৬৪) এবং ‘খেলারাম খেলে যা’।

‘এক মহিলার ছবি’—অন্ত-অসঙ্গতি সম্পন্ন সমাজ-অন্তর্গত এক মহিলার মানসিক জটিলতার চিত্ররূপ; আত্মমগ্ন চেতনার আত্ননাদ। মানসিক দরবলতা, নৈঃসঙ্গ, অবিশ্বাস—নাসিমাকে অক্টোপাশের মত নিঃশেষ করেছে। প্রচলিত উপন্যাস ফর্ম থেকে ‘এক মহিলার ছবি’ ব্যতিক্রমী। ভাঙা ভাঙা, ছেঁড়া ছেঁড়া—ভঙ্গকর্ম স্মৃতিচারণ ও চেতনার আবেগ, এ উপন্যাসে শব্দরূপ পেয়েছে। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ হয়েছে—প্রবল আবেগের অনুরণে ও শীতলতায়। গদ্যরীতি কবিতাকান্ত; বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উপমাবহুল। দৈবতভালবাসা ও সন্তান প্রত্যাশার সহজাত বৃত্তি নিয়ে রচিত উপন্যাস ‘দেয়ালের দেশ’। ‘অনুদূপ দিন’ রচিত হয়েছে অবচেতন মনের দৈবতভালবাসার বিশ্লেষণ নিয়ে; ‘সীমানা ছাড়িয়ে’ রাজনীতি, প্রণয় এবং শিল্পী-সত্তার পরাজয়ের শিল্পকথা। সৈয়দ শামসুল হকের চরিত্রগুলির অন্তর্যন্ত্রণার ও অন্তর্মর্দখিতার তীব্রতাকে ধারণ করতে তার গদ্য সাবলীল।

‘খেলারাম খেলে যা’—উপন্যাসের নায়ক এ সমাজে দলক্ষ্য নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক নিরাসক্তি, অন্তরঙ্গতা ও আত্মনিমগ্নতার অবিদ্বন্দ্বিতায়—উপন্যাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল-আজাদের ‘তেইশ নম্বর তৈল চিত্র’—শিল্পী জাহেদ এবং তার স্ত্রী ছবি, জামিল ও তার স্ত্রীর মনোবিশ্লেষণ ও মনোবিকলনের শিল্পরূপ। বিধবা নারী বিলকিসের অরুদ্র যৌন-চেতনার বিকৃতির বিশ্লেষণ ‘শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন।’ তা সত্ত্বেও, জীবনের অসঙ্গতি, কদর্যতা, বিকৃতির উদ্বেগ মানব

আত্মমর্জির সম্মান পায়—এই ‘হাঁ অর্থক’ জীবনবোধ—উপন্যাস দর্পটির পরিণামী সিদ্ধান্ত। আলাউদ্দিন আল-আজাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এবং বাংলাদেশী উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন—‘ক্ষুধা ও আশা’। “গ্রাম জীবনের বৈচিত্র্য, শহর জীবনের অশুকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ বর্গের সার্বিক পরিচয় ‘ক্ষুধা ও আশা’র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।” আলাউদ্দিন আল আজাদের বস্তুনিষ্ঠা জীবনবোধ ও মনোবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর ‘ক্ষুধা ও আশা’। শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্ভুক্তি যে সমাজ বিকশিত হয়—এ সত্য আলাউদ্দিন আল-আজাদে সচেতনভাবে উচ্চারিত হলো। জোহী-পরিবারের উন্মূলিত হওয়া এবং নিঃশেষিত হওয়া ‘ক্ষুধা ও আশা’র চরম বাক্য নয়। ‘কর্ণফুলি’, চট্টগ্রামের সম্প্রদায় বিশেষের জীবনালেখ্য। চরিত্র ও ঘটনা আতিশয্য মত্ত নয়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ ব্যতীত, শ্রেণীসচেতন উপন্যাসিকের মধ্যে শিল্পগৌরবে যার নাম উচ্চারিত হয়—তিনি শহীদুল্লাহ কায়সার। তাঁর দর্পটি উপন্যাস ‘সারেং বো’ (১৯৬২) এবং ‘সংসপ্তক’ (১৯৬৫)।

‘সারেং বো’—বিষয় গৌরবে অভিনব ; নবীতুন চরিত্র নির্মাণে গৌরবান্বিত ; বেদনার শব্দরূপে অন্তরঙ্গ। অতি গীতলতা উপন্যাসটির দৃঢ়তাকে দ্রবল করেছে ; আবেগ-আতিশয্য পরিণামকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। শহীদুল্লাহ কায়সারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘সংসপ্তক’। এ উপন্যাসে, “বৃগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবন চেতনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এটি এপিকধর্মী উপন্যাস। বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে ‘সংসপ্তক’ পূর্ব বাংলার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলোর অন্যতম।”

জাহির রায়হানের জীবনদর্পটি মূলতঃ রোমান্টিক। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটিতে রোমান্টিক দর্পটি দিয়ে গ্রাম জীবনের অনাদৃত রূপকে দেখা হয়েছে। এই রোমান্টিক দর্পটির চোরাবালিতে ‘বরফ গলা নদী’ উপন্যাসের পরিণাম অস্বাভাবিক ও মেলো-ড্রামাটিক হয়ে উঠেছে। জাহির রায়হান জীবনবোধে রোমান্টিক—দর্পটিতে আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক।

১৯৫৮-৭০ পর্বে বাংলা উপন্যাসের গতি বিচিত্রমুখী—উপন্যাসিকের সংখ্যাও অনেক। অনেকেই গুরুগত উৎকর্ষে, জীবনদর্পটির স্বাতন্ত্র্য ভাষা ও গঠনরীতির সৌকর্ষে উল্লেখযোগ্য।

মীজানুর রহমান শেলীর ‘পাতালে শূরবরী’ ; হুমায়ূন কাদিরের ‘নির্জন মেঘ’, আবদুর রাজ্জাকের ‘কন্যাকুমারী’ ; রশিদ করিমের ‘উত্তমপদ্রব’ এবং ‘প্রসন্ন পাষণ’ ; আহসান হাবীবের ‘অরণ্য নীলিমা’, আতাহার হোসেনের ‘পিপাসা’—প্রভৃতি উপন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় অবিকশিত নগরজীবনের বহু বিকম জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে।

এ পর্বের আরেকটি ধারা ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকাংশ উপন্যাসের উপাদানসমূহ শিল্পরূপ পেয়েছে। ইবনে রশীদে 'ফাল্গুন করা' (১৯৫৮), চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়' (১৯৬২), আবদুজ্জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৪) এবং মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' উল্লেখযোগ্য।

এ পর্বের সত্যেন সেন একক নাম। বিষয়র বৈচিত্র্যে তাঁর উপন্যাস নানামুখী। 'অভিশপ্ত নগরী' বাদে প্রায় সকল উপন্যাসেই বক্তব্য ও কর্ম, চেতনা এবং পরিশীলিত ভাষারীতির সঙ্গে সমন্বিত নয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—কাল সময়ে পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ—ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঠিকই প্রবাহমান ছিল। এই সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্বিক প্রবাহ—১৯৪৮-এ, ১৯৫২-এ জীবনের উপরিতলে আছড়ে পড়েছিল—গণজাগরণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯-এ। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে দ্বন্দ্বিক বিকাশের প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত হল। আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যিক। ১৯৪৭-৭১ কাল পরিসরে সমাজ-বিকাশের দ্বন্দ্ব-প্রবাহ ও জীবন-সংঘাতকে, শিল্পরূপ দিতে আমাদের উপন্যাস-শিল্প কতটুকু সত্যসন্ধ ছিল, তা বিচার্য বিষয়। এ প্রশ্নের জবাব ঔপন্যাসিক, আলোচক এবং পাঠক সকলের কাছেই পরিচ্ছন্ন হওয়া—ইতিহাসের প্রয়োজনে—আজ বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে স্বল্পসংখ্যক : শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য' ও 'দুই সৈনিক' ; রশীদ করিমের 'আমার যত গ্লানি' ; মাহবুব তালুকদারের 'অবতার' ; তরুণ ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমদের 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার'। এছাড়াও যুদ্ধকালীন সময়ে লেখা 'দুটো উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে—আনোয়ার পাশার 'রাইফেল, রোটী আওরত' এবং শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হইতে বিদায়'।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রকাশিত উপন্যাস পড়ে আশান্বিত হওয়ার মত অভিনব কিছু পাইনি। রশীদ করীমে উচ্চারিত হয়েছে—আত্মধিকার, অনুরোধচনাবোধ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী-চরিত্রের অক্ষমতা। মাহবুব তালুকদারের 'অবতার' যুদ্ধকালীন জীবনের রোমান্টিক আখ্যান চিত্র। তরুণ হুমায়ূন আহমদে দেখলাম আত্মমগ্ন চেতনাপ্রবাহরীতির ভিন্ন অনবর্তন, যা ইতোমধ্যেই সাহিত্য আদর্শ হিসেবে এদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে বহু ব্যবহৃত এবং প্রাক্তন। শওকত ওসমানের উপন্যাসত্রয়ী পড়তে পড়তে বারবার প্রশ্ন জেগেছে—'জননী'র শওকত ওসমান কি নিঃশেষিত।

‘ক্লদা ও আশা’র একটা অংশ মনে পড়ছে—‘ইতিহাস পড়ে একটা জিনিস আমি বদ্বোধি, ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি আছে তাতে ব্যক্তি নিজেকে জড়িয়ে চলে মাত্র ; চেষ্টা করলে সেই গতিকে বিভ্রান্ত বা বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু রোধ করতে পারে না।’ জীবনের এই সত্যকে রূপান্তরিত করতে আজ আমাদের প্রয়োজন—নতুন সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা, ইতিহাসসচেতন চেতনাপ্রবাহ, অনিবার্য শব্দাবলী এবং চিত্রকল্প।